সৃজনবৈচিত্র্যের সুবিশাল পরিসর। মাধ্যম ও করণকৌশলের বিচিত্র দুনিয়া ছিল কামরুল হাসানের। রং, রেখা ও অবয়বের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিত্রতল হিসেবে জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু বেছে নিয়েছেন। কাগজ, ক্যানভাস আর খেরোখাতার পাতা থেকে শুরু করে পরিত্যক্ত সিগারেটের প্যাকেট– কোথায় জায়গা করেনি কামরুল হাসানের তুলির আঁচড়! প্রদর্শনীতেও দেখা গেল সেই সৃজন নমুনার কিছু অনন্য উদাহরণ। সেই সঙ্গে রয়েছে কামরুল হাসানের কাঠখোদাইয়ে নির্মিত বেশ কিছু ছাপচিত্রও।

কলাকেন্দ্রের কিউরেটর শিল্পী ওয়াকিলুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই মূলত এ আয়োজনটি সম্ভব হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের শিল্পচর্চার এই স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তিত্বের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে দেখা যায়নি রাষ্ট্রীয় তেমন কোনো উদ্যোগ।

আমাদের চিত্রকলা ও জাতীয় জীবনের এই অতুলনীয় রূপকারের সম্পর্কে ওয়াকিলুর রহমান বলেন, 'বিশুদ্ধ শিল্প, ব্যবহারিক শিল্প, প্রচ্ছদ শিল্প, কার্টুন শিল্প, বই অলংকরণ, সাজসজ্জা, স্থাপনা শিল্প সর্বত্রই ছিল তার নিঃসংকোচ বিচরণ। তার কাজের সংখ্যা, ছবির সংখ্যা নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তার ভাবনার বিষয়, কাজের বিষয় ছিল বাংলা, বাংলার মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তু, গাছপালা, লতাপাতা, আলো-বাতাস, রং-আনন্দ, আবেগ-অনুভূতির উদযাপন। ছিল দুঃখকষ্ট, ব্যথা, অন্যায়ের প্রতিবাদ। কামরুল হাসান ছিলেন ঐতিহ্য, পরম্পরা নিয়ে কোনো ধরনের হীনম্মন্যতা ছাড়া আত্মপরিচয়ে গর্বিত মানুষ। ফলাফলে আমরা পেয়ে যাই এ অঞ্চলের দৃশ্য শিল্পের ভাষা নির্মাণে, নান্দনিক উপস্থাপনায়, স্বকীয় আধুনিক শিল্পকর্ম। জীবনের সর্বত্র, সর্ব কাজে শিল্পসংযোগ, নান্দনিক স্পর্শ ছিল তার মূল ভাবনা। বাংলার নর-নারী, প্রকৃতি, জীবনকে তার মতো আর কেউ এত সুন্দর, সতেজ, রসে এঁকেছে কি!'

সত্যি তাই– বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার পাটাতনটা যে ক'জন মানুষের সৃজনে ও উদ্যোগে অবয়ব পেয়েছে, কামরুল হাসান তাদের অন্যতম। সেখানে কামরুল হাসান আমাদের শিল্পচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর গঠনেই কেবল নিয়োজিত ছিলেন না, নিজের সৃজনগুণেও তাকে চিরকালের জন্য এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। আর অবধারিতভাবেই তা বাংলার রঙে ও রূপে, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরম্পরায়।

কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে সংমিশ্রিত। মৌলিক রং ব্যবহার করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন কামরুল হাসান। রেখার ব্যবহারে দেখা গেল, তিনি ছবি যতটা আঁকছেন, তার চেয়ে পার্শ্বচিত্র বেশি ফুটে উঠছে। এতে ছবি ত্রিমাত্রিকতার পাশাপাশি নতুন পটে মানুষের সামনে হাজির হচ্ছে। তার রং লেপন এবং তেলরং ব্যবহারের অনন্যতা ছবিকে আরও জীবন্ত করে আমাদের সামনে হাজির করে।

বাংলার সংস্কৃতিজাত নানা উপাদান ও প্রতীকের সঙ্গে সঙ্গে কামরুল হাসানের বেশিরভাগ ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে নারী। কখনও এককভাবে, কখনও দলবদ্ধ। বাংলার সমাজ বাস্তবতার আবহমান অবয়বেই নারীকে কামরুল হাসান রং ও রেখার কৌশলকে পুরোপুরি ছাপিয়ে উপস্থাপন করেছেন– সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গিতে। এই সহজিয়া ধারা পাওয়া যায় তার অপরাপর সমস্ত অবয়বে।

কামরুল হাসানের নারীর অবয়ব, কোমলতা, কৌতূহল, ভয় সবকিছুই ফুটে উঠেছে সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংগতি রেখে। চিত্রগুলো যেন আমাদের গ্রামবাংলারই প্রকৃতি ও জীবন থেকে উৎসারিত। দেখতে গেলে এক ধরনের ঘোর তৈরি হয় নিজের মধ্যে। রং ও রেখার নিজস্ব প্রকাশে মায়াময় অপূর্ব এক মিশ্রণ তৈরি করে রেখে দিয়ে গেছেন যেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। চিত্রকলায় লৌকিকতার সঙ্গে ঘটিয়েছেন আধুনিকতার মিশ্রণ। তাই তাকে মানুষ ডাকত পটুয়া কামরুল হাসান নামে। তিনি নিজেও এ পরিচয়েই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তিনি নিজে পটুয়া ছিলেন না, কিন্তু পটুয়া নামে গর্ববোধ করতেন। এই গৌরব তার স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিঃসংকোচ ভালোবাসা থেকে সঞ্জাত। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ রয়েছে তার জীবনের পরতে পরতে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বাংলার অন্তরাত্মার ধারণে ও চর্চায় তার প্রচেষ্টা কেবল তুলি-ক্যানভাসেই থেমে থাকেনি।